ভাস্কর্য

✓ বিধান
✓ উৎসমূল
✓ করণীয়

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি
(হাফিযাহুল্লাহ)

ভাস্কর্য

বিধান-উৎসমূল-করণীয়

শায়খ ফজলুর রহমান কাসিমি হাফিযাহুল্লাহ

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভাস্কর্যপ্রীতি, না গণইরতেদাদ?

হৃদয়ে অনেক গভীর ক্ষত নিয়ে আজ লিখতে বসেছি। মুজিব ভাস্কর্যের মতো তুচ্ছ ও নগণ্য একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষ আজ দলে দলে ঈমানের মতো জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে হাত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে! সকাল সন্ধ্যা যেন সর্বত্র এক গণইরতেদাদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর এর চেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ আর কী হতে পারে, যাতে তিনি বলেছেন, মুমিন অবস্থায় সকাল যাপন করবে তো সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। মুমিন অবস্থায় সন্ধ্যায় উপনীত হবে তো সকালে কাফের হয়ে যাবে।

উলামায়ে কেরামের ভাবা দরকার!

উলামায়ে কেরামের ভাবা দরকার, আমরা খারেজিদের ফেতনাকে ভয় করতে করতে মুরজিয়াদের পথেই হাঁটছি কি না? খারেজিদের মতো শুধু গুনাহের কারণে তাকফীর করা থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাকফীর থেকে এতই দূরে সরে গিয়েছি কি না যে, সুস্পষ্ট ও অকাট্য কুফরে বাওয়াহকেও আমরা কুফর বলছি না এবং তাকফীরের সকল শর্ত পূরণ করার পরও আমরা অকাট্য মুরতাদের ইরতেদাদের হাকিকতকেও জাতির সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরছি না? যার ফলে আমাদের অনুসারীদের কাছেও কুফর শিরকগুলো এতই হালকা হয়ে গেছে যে,

তারা নাউযুবিল্লাহ সেগুলোকে গুনাহ মনে করাও জরুরি মনে করছে না?

আমার মনে হচ্ছে অন্তত আমাদের এ অঞ্চলে বহুকাল থেকে ঘটনা তাই ঘটে চলেছে। রাষ্ট্র থেকে ইসলামকে বিচ্ছিন্ন করা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদের মতো জঘন্য কুফর শিরকগুলোর বিষয়ে এবং এগুলোকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা মুশরিকদের ব্যাপারেও আমরা একই আচরণ করছি, যার বিষবাষ্প অতি প্রকাশ্যে কিংবা অতি সংগোপনে আমাদের ঈমানের দুর্গকে বহু আগেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছে এবং এখন প্রসঙ্গ সামনে আসায় ঘরে ঘরে গণইরতেদাদের শুধু বহিঃপ্রকাশ ঘটছে।

গণইরতেদাদের যে প্রতিযোগিতামূলক বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, তা দেখেই গা শিউরে উঠছে। এই বহিঃপ্রকাশ তো কেবল তাদের, যারা মঞ্চে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে, মাইক হাতে পাচ্ছে এবং মিডিয়ায় আমরা জানতে পারছি। তাদের পেছনে তাদের লক্ষ লক্ষ যে অনুসারী আছে, তাদের কথা ভাবলে তো হাত পা অবশ হয়ে আসে। এতদিন যাদেরকে উলামায়ে কেরাম ‘মাস্তূরুল হাল’ (মুরতাদ হওয়ার বিষয়টি অপ্রমাণিত) হওয়ার ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোনো ভাঙ্গাচোরা ওজর দিয়ে তাদেরকে মুসলিম গণ্য করার ন্যূনতম সুযোগটি গ্রহণ করতেন, এখন তো তাও হাতছাড়া হয়ে গেল! জানি না, কী দুর্গতি এই জাতির কপালে অপেক্ষা করছে!

আল্লাহ এই ধ্বংসাত্মক আগুনের বিভিষিকা থেকে আমাদের হেফাজত করো। বিষয়টি সামনে আসার পর রীতিমতো শরীরে কাঁপন ধরে গেছে, জানি না কখন নিজের কিংবা কোনো নিকটাত্মীয়ের ঈমানও ভেঙ্গে পড়ে! আমাদের রক্ষা করো আল্লাহ! তোমারই আশ্রয় চাই আমরা! একমাত্র তোমার আশ্রয় ও করুণা ব্যতীত বিন্দুমাত্র উপায়-অবলম্বন আমাদের নেই!

ভাবা দরকার, আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত বিধান গ্রহণ করার পরও যারা এতদিন বলেছে—তারা এটাকে হালাল ও বৈধ মনে করে না, কিংবা তা যে হারাম তা তারা জানে না, সুতরাং তারা কাফের হবে না—এখন তারা কী বলবে? ভাবা দরকার এখন যারা আলেমদের মুখ দিয়ে ভাস্কর্যকে 'শুদ্ধ', 'হালাল' বলানোর জন্য লাঠি সোটা নিয়ে মাঠে নেমেছে, তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দেয়া হবে? ভাস্কর্য সম্পর্কে ইসলামের বিধান বলার কারণে যারা আলেমদের অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করছে, তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দেয়া হবে? তাদের নিকটাত্মীয় ও স্ত্রীরা যদি এই ইরতেদাদের কারণে আলাদা হতে চান, তাদেরকে কী ফতোয়া দেওয়া হবে?

কথাগুলো অনেক কষ্ট থেকে বলছি। উলামায়ে কেরামের কাছে হাত জোড় করে বিনীত অনুরোধ করছি, ঈমান কুফরের বিষয়গুলো নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবুন। শাখাগত বিষয়গুলোকে শাখা পর্যায়ে রেখে ঈমান কুফরের বিষয়গুলোকে ইলমি ও আমলী চর্চা এবং দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করুন। উম্মাহর সামনে কুফর-শিরককে কুফুর-শিরক হিসেবে পরিষ্কার চিহ্নিত করে দিন। কুফর-শিরকের কঠিন বিধান ও ভয়াবহতা উম্মাহর সামনে তুলে ধরুন। মনে রাখতে হবে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সকলের দাওয়াতের প্রধান বিষয় ও কেন্দ্রবিন্দু এগুলোই ছিল।

আমাদেরকে আরো মনে রাখতে হবে, খারেজিদের ফেতনা যেমন ভয়ঙ্কর ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী, মুরজিয়াদের ফেতনাও তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। নাজাত ও মধ্যপন্থা মূলত এ দুই বিচ্যুতির মাঝামাঝি স্থানে।

মুজিব ভাস্কর্য কি শুধুই ভাস্কর্য?

আরো ভাবা দরকার, যে মুজিব ভাস্কর্য নিয়ে আমাদের বিতর্ক, সেই ভাস্কর্য কি শুধুই ভাস্কর্য এবং সৌন্দর্যের প্রতীক, না পূজার মূর্তির চেয়েও বড় কিছু? যে ভাস্কর্যের শরঈ বিধান বলার কারণে উলামায়ে কেরামকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করা হয়, যে ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে আইনগত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যে ভাস্কর্য ভাঙ্গার জন্য উলামায়ে কেরামসহ নিন্দা জানাতে 'বাধ্য' হন, যে ভাস্কর্যের ইজ্জত রক্ষার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করার শপথ গ্রহণ করা হয়, যে ভাস্কর্যের ভালবাসায় অন্ধ হয়ে শরীয়তের বিধানকে উপেক্ষা করা হয়, যে ভাস্কর্যের জন্য শরীয়তের বিধানকে ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ ও উপহাস করা হয়, সেই ভাস্কর্য কি শুধুই ভাস্কর্য আর সৌন্দর্যের প্রতীক? কস্মিনকালেও না! বরং একেই তো 'ওয়ালেহানা মুহাব্বত' এবং ইলাহ ও মা'বুদের প্রতি আবেদের 'ঈমান' ও হৃদয়ের গভীর ভালবাসা বলা হয়। এই বাস্তবতার বিবরণ খোদ আল্লাহ রাব্বুল আলামি কোরআনে কারীমে দিয়েছেন এভাবে-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) سورة بقرة

অনুবাদঃ "মানুষের মাঝে কতক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অনেক শরিক গ্রহণ করে। তারা সেসব শরিককে আল্লাহর মত ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে অনেক ভালোবাসে। যারা অন্যায় করছে তারা যখন আযাব দেখবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, সকল শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।" -সূরা বাকারা-১৬৫

বস্তুত এই মুজিবপ্রেমীরা মুজিবকে এবং তার উত্তরসূরীদেরকে বহু আগেই রব বানিয়ে নিয়েছে। একারণেই তারা শরীয়তের বৈধাবৈধ অপেক্ষা তাদের রব ও প্রভুদের বৈধাবৈধকে অধিক গুরুত্ব দেয়। শরীয়ত এটাকেই রব বানানো এবং তাদের ইবাদত বলে গণ্য করে। নিম্নোক্ত হাদীসটিতে যা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে-

عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة { ا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله } قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب ومن سورة التوبة

অনুবাদঃ "আদি ইবনে হাতিম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তখন আমার গলায় একটা স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলানো ছিল। তিনি আমাকে বললেন, আদি তুমি তোমার গলা থেকে এ মূর্তিটা ফেলে দাও! তখন তিনি এ আয়াত পড়ছিলেন

ا تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে'।

তারপর বললেন, তারা তাদের ইবাদত করত না। তবে তারা যা হালাল করে দিত তাকে তারা হালাল হিসাবে গ্রহণ করত, আর যখন কোন কিছুকে হারাম করে দিত তখন তারা তাকে হারাম হিসাবে গ্রহণ করত।" -সুনানে তিরমিযী

ভাস্কর্য বৈধ প্রমাণের চেষ্টা নিঃসন্দেহ নেফাক ও হঠকারিতা

অত্যন্ত আফসোস ও পরিতাপের বিষয়! আজ ভাস্কর্য ইসলামে অবৈধ হওয়ার বিষয়ে, ইসলামের জন্ম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সকল ইসলামী আলিম ও শরীয়াহ বিশেষজ্ঞের একমত হওয়া সত্ত্বেও এক শ্রেণীর জ্ঞানপাপীরা বিষয়টিকে ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে!

পৃথিবীর সকল ডাক্তার ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিষয়ে একমত পোষণ করতেন, কিংবা পৃথিবীর সকল পদার্থ বিজ্ঞানী যদি পদার্থ বিজ্ঞানের একটি বিষয়ে একমত পোষণ করতেন, তারপর যাদের উক্ত বিজ্ঞানগুলোর সঙ্গে ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই, এমন কিছু লোক যদি তাদের বিরোধিতা করত, তখন আজকের ভাস্কর্যের বৈধতা প্রমাণের চেষ্টায় মরিয়া 'শিক্ষিত' মুজিবপ্রেমীরা তাদেরকে মানসিক বিকারগ্রস্ত বৈ কিছু ভাবতে পারতেন কি না, জানি না।

বস্তুত তারাও জানে বিষয়টি ইসলামে অবৈধ। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশে তারা তা গেলাতে পারবে না বলে, নেফাক, শঠতা ও কপটতার আশ্রয় নিয়েছে। এটা তাদের সৎ সাহসের অভাব এবং নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই দুর্বলতা। গণতন্ত্রের গোড়াতেই যেখানে তারা ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্র থেকে আল্লাহ ও তাঁর বিধান বাদ দিয়ে অন্যকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে নিয়েছে, সেখানে তাদের সৎ সাহস থাকলে একথাই বলত যে, রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় বিষয়ে ইসলাম চলবে না। কিন্তু তা না করে ইসলামের আদ্যোপান্ত কোনো কিছুতেই তাদের বিশ্বাস না থাকলেও; সাধারণ জনগণকে প্রতারিত করে, তাদের ইলাহ ও অধর্মের বিষয়গুলো গেলানোর জন্য তারা ইসলামেরই অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিচ্ছে

এবং উল্টো যারা ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরছেন, তাদেরকে তারা ধর্ম ব্যবসায়ী বলে গালি দিচ্ছে!

এমন জ্ঞানপাপ, নেফাক ও কপটতার বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক কোনো উত্তর হয় না। এজন্য আমরা তথাকথিত এই 'চেতনাজীবি'দের অপলাপের ইলমি ও গবেষণাধর্মী কোনো প্রতি উত্তরের প্রয়োজন বোধ করি না। তাছাড়া উলামায়ে কেরাম যেভাবে বিষয়গুলো পরিষ্কার করে ফতোয়া প্রচার করেছেন, বিবেকবানদের জন্য ততটুকুই যথেষ্ট। যারা বিস্তারিত পড়তে চান, তারা নিচের ফতোয়া পড়ে নিতে পারেন:

https://tinyurl.com/Hefazot-Fatwaa

এই লেখার উদ্দেশ্য

আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের মতো একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে এরকম রাষ্ট্রীয়ভাবে মূর্তি ও ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠার মূল উৎস ও নেপথ্য কারণটির প্রতি ইঙ্গিত করা। আলহামদুলিল্লাহ উলামায়ে কেরামে যেভাবে ভাস্কর্য স্থাপনের বিরুদ্ধে জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন করে যাচ্ছেন, তা নাহি আনিল মুনকারের অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর। আল্লাহ তাদের মেহনত মুজাহাদা কবুল করুন এবং শিরকের বিরুদ্ধে তাদের এই আন্দোলনে সফলতা দান করুন।

ভাস্কর্য একটি উপসর্গ মাত্র, উৎসমূল ভিন্ন কিছু

কিন্তু বস্তুত কোথাও একটি মূর্তি স্থাপন করা মূল সমস্যা নয়; বরং এটি মূলত একটি উপসর্গ মাত্র। কোনো রোগের উপসর্গ যখন মাত্রা

ছাড়িয়ে যায়, তখন সেই উপসর্গেরও চিকিৎসা করতে হয়, কিন্তু তা করতে হয় সাময়িক কিংবা মূল রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি। পক্ষান্তরে মূল সমস্যা আপনা জায়গায় জিইয়ে রেখে বা মূল সমস্যার কথা ভুলে গিয়ে শুধু উপসর্গের চিকিৎসায় নিয়োজিত হওয়া আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত। এই লেখায় মূলত আমরা সেই মূল সমস্যাটি চিহ্নিত করার চেষ্টা করব এবং উলামায়ে উম্মত ও মুসলিম উম্মাহকে বিনীত অনুরোধ করব, শিরকের একটি উপসর্গের বিরুদ্ধে তারা যেভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঈমানের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগী হবেন এমন আরো হাজারো উপসর্গের জনক ও উৎসমূলটি সমাধানের প্রতি।

দ্বিতীয়ত, যেসবব সাধারণ মুমিন এই জ্ঞানপাপীদের প্রতারণার শিকার হয়ে অজ্ঞতাবশত ঈমান হারাচ্ছেন, তাদের জন্য প্রাণীর ভাস্কর্য (পূজার উদ্দেশ্যে না হলেও তা) যে ইসলামে নিষিদ্ধ ও হারাম, এবিষয়ক কিছু হাদীস এবং অতি সংক্ষেপে ফিকহ ও ইসলামী শরীয়াহ'র সিদ্ধান্তটি পেশ করাও এই লেখার একটি উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিধান সম্পর্কে এমন দু'একটি কথা বলা, যেগুলো খুবই জরুরি, কিন্তু সাধারণত বলা হচ্ছে না।

ভাস্কর্য ও মূর্তি এক না ভিন্ন? বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন!

যদিও বাংলা একাডেমী ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির মতো গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং এছাড়াও অনেক নির্ভরযোগ্য সূত্রই বলছে, আভিধানিক অর্থে ভাস্কর্য ও মূর্তি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবুও আমরা সেই বিতর্কে যেতে চাই না। কারণ এই বিতর্ক তখনই ফলদায়ক হত, ভাস্কর্য ও মূর্তির পার্থক্য করার পর যদি শরীয়তের কোনো দলিল থেকে একথা দেখানো যেত যে, শরীয়ত প্রাণীর ভাস্কর্যকে হারাম বলে না। কিন্তু

যারা দুটি পার্থক্য প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, তাদের কেউই এমন কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেননি। আসলে প্রাণীর ভাস্কর্য বৈধ হওয়ার কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেইও। তার বিপরীতে তা অবৈধ হওয়ার বিষয়ে শরীয়তের অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। অর্থাৎ ভাস্কর্য আর মূর্তিকে যদি আলাদা ধরাও হয়, তাহলেও শরীয়তের হুকুম হল দুটোই হারাম। পূজার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও যে প্রাণীর আকৃতি হারাম ও নাজায়েয, আর পূজার সামগ্রী হলে সেটা যে শিরক। কাজেই ভাস্কর্য ও মূর্তিকে আলাদা যদি প্রমাণ করাও হয় তাতেও শেখ মুজিবের 'ভাস্কর্য' হালাল হয় না, তা হারামই থাকে।

তওবার আহ্বান!

মনে রাখবেন, যে কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য তৈরি, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের মতো হারাম বিষয়, যা অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর সকল উলামায়ে কেরামের ইজমা ও ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত, এমন কাজকে যদি কেউ বৈধ মনে করে, সঙ্গে সঙ্গে সে মুরতাদ হয়ে যাবে, ইসলামের দৃষ্টিতে যা সাধারণ কাফের মুশরিক অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। তার সম্পর্কে শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান হল, মুসলিম শাসক তাকে হত্যা করবে। তার বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। তাকে মুসলিমদের গোরস্তানে দাফন করা যাবে না। সুতরাং যেসব মুসলিম ভাই-বোন ইতিমধ্যে শয়তানের ধোঁকায়, পদমর্যাদার লোভে কিংবা অজ্ঞতাবশত এমনটি করে ফেলেছেন, তাদেরকে বিনীত অনুরোধ করব, মৃত্যু কখন চলে আসে বলা যায় না। দ্রুত তওবা করে ঈমান নবায়ন করুন এবং বিবাহ নবায়ন করুন। অন্যথায় নিশ্চিত জাহান্নমের অগ্নিকুণ্ড আপনার মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে মাত্র! আমাদের দায়িত্ব জানিয়ে দেয়া! সকলের আমলের হিসেব তাকেই দিতে হবে!

ভাস্কর্য: হাদীসের নির্দেশনা

এখানে আমরা যে হাদীসগুলো পেশ করব, সেগুলোতে প্রাণীর ছবি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য, মূর্তি ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞা বর্ণনার জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষ করে صورة (ছূরাহ) শব্দটি সর্বাধিক হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধান এবং শরীয়তের পরিভাষা; উভয় দিক থেকেই আরবী 'সূরাহ' শব্দটি যে কোনো আকৃতিকে শামিল করে। চাই সে আকৃতি কাগজে অঙ্কিত হোক বা কাঠ-পাথর কিংবা অন্য কিছুতে খোদইকৃত হোক। পূজার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও যে প্রাণীর আকৃতি হারাম ও নাজায়েয, এই স্বতন্ত্র বিধানটিই মূলত অধিকাংশ হাদীসগুলোতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর পূজার সামগ্রী হলে সেটা যে শিরক, তা তো কোরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতেই বলা হয়েছে। সেটা প্রাণীর না হয়ে জড়পদার্থের হলেও শিরক। আগেই বলেছি, এ লেখায় আমরা সেই বিশ্লেষণে যেতে চাই না। সংক্ষেপে কয়েকটি হাদীস এবং ফিকহের উদ্ধৃতি পেশ করব শুধু।

০১. আবু যুরআ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

دخلت مع أبي هريرة في دار مروان، فرأى فيها التصاوير، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة، وليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة.

অনুবাদঃ "আমি আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু'র সঙ্গে মারওয়ানের ঘরে প্রবেশ করলাম। সেখানে কিছু (প্রাণীর) চিত্র তাঁর

নজরে পড়ল। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন-

ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي

'ওই লোকের চেয়ে বড় জালেম কে আছে, যে আমার সৃষ্টির মতো কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চায়। (তাদের ক্ষমতা থাকলে) সৃষ্টি করুক দেখি একটি কণা, একটি শষ্য কিংবা একটি যব'!" -সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২১১১; সহীহ বুখারী হাদীস নং ৫৯৫৩

০২. উসামা ইবনে যায়েদ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا قال فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. مسند أبي داود الطيالسي، الحديث الثاني من مسند أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، ص:87، نسخة حيدربا الدكن، الطبعة الأولى سنة 1321هـ

অনুবাদঃ "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাবা ঘরে প্রবেশ করেছি। তিনি কিছু (প্রাণীর) আকৃতি দেখলেন। তিনি বালতিতে পানি আনতে বললেন, অতঃপর আকৃতিগুলো মুছতে থাকলেন এবং বলতে থাকলেন, আল্লাহ এমন মানুষদেরকে ধ্বংস করুন, যারা এমন কিছুর আকৃতি তৈরি করে, যা তারা সৃষ্টি করতে পারবে না।" -মুসনাদে আবু দাঊদ তায়ালিসী পৃ: ৮৭

০৩. জাবের রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

دخلنا مع النبي صلى الله عليه و سلم مكة في البيت وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما تعبد من دون الله قال فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فكبت كلها لوجوهها ثم قال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم البيت فصلى فيه ركعتين فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد جعلوا في يد إبراهيم الأزلام يستقسم بها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بزعفران فلطخه بتلك التماثيل. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب المغازي، حديث فتح مكة

অনুবাদঃ "আমরা মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বাইতুল্লাহে প্রবেশ করেছি। তখন বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে তিন শত ষাটটি মূর্তি ছিল, আল্লাহকে ছেড়ে যেগুলোর উপাসনা করা হত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো ভাঙ্গার আদেশ করলেন। তারপর সবগুলো মূর্তি উবু হয়ে পড়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, সত্য এসেছে এবং বাতিল অপসারিত হয়েছে, আর বাতিল অপসারিত হওয়ার মতোই। এরপর তিনি বাইতুল্লাহে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। সেখানে তিনি ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামের ভাস্কর্য দেখলেন। তারা - মুশরিকরা- ইবরাহীমের হাতে ভাগ্য নির্ধারণী 'শর' স্থাপন করে রেখেছে। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। ইবরাহীম শর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাফরানের রং আনতে বললেন এবং আকৃতিলোর উপর তা লেপে দিলেন।" - মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, কিতাবুল মাগাযী, ফাতহে মাক্কা অধ্যায়

০৪. আয়েশা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহা বর্ণনা করেন,

أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب نقض الصور

অনুবাদঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে (প্রাণীর) কোনো প্রকার আকৃতিই ছেড়ে দিতেন না; সব মুছে ফেলতেন।" -সহীহ বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবু নাকযিস সুয়ার

০৫. আবুল হায়াইয়াজ আসাদী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر

অনুবাদঃ "আলি রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজে পাঠাব, যে কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তুমি (প্রাণীর) যত ভাস্কর্য পাবে সব নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে, আর যত সমাধি-সৌধ পাবে, সব সমান করে ফেলবে?" -সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয, বাবুল আমর বিতাসবিয়াতিল কাবর

০৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم). صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة

অনুবাদঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা (প্রাণীর) এসব আকৃতি তৈরি করে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ সেগুলোকে জীবিত কর।" -সহীহ বুখারী

০৭. আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون). صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب

অনুবাদঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন সবচাইতে বেশি শাস্তি দেয়া হবে (প্রাণীর) আকৃতি নির্মাতাদেরকে।" -সহীহ মুসলিম

০৮. ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

سمعت محمدا صلى الله عليه و سلم يقول (من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ). صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ

অনুবাদঃ "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (প্রাণীর) আকৃতি তৈরি করবে, কেয়ামতের

দিন তাকে বলা হবে, তাতে রুহ দেয়ার জন্য, আর সে কখনো তা পারবে না।” -সহীহ বুখারী

০৯. সাঈদ ইবনে আবুল হাসান রহিমাহুল্লাহ বলনে,

كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبن عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سمعته يقول (من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا). فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك

অনুবাদঃ “আমি ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিলাম, তখন এক লোক আসল এবং বলল, হে ইবনে আব্বাস! আমি এমন একজন মানুষ, যার জীবিকা হাতের কাজের উপর, আমি ছবি-ভাস্কর্য তৈরি করি। ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি তোমাকে তাই বলব যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন (প্রাণীর) আকৃতি তৈরি করবে, সে তাতে রুহ দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতে থাকবেন, আর সে কস্মিনকালেও তাতে রূহ দিতে পারবে না। এ কথা শুনে লোকটি পেরেশান হয়ে গেল এবং তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তখন ইবনে অব্বাস বললেন, দূর হও! তুমি যদি ছবি তৈরি করতেই চাও তাহলে তুমি গাছ ইত্যাদির ছবি তৈরি কর, যার মধ্যে রূহ নেই।” -সহীহ বুখারী

১০. সালিম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

وعد النبي صلى الله عليه و سلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه و سلم فخرج النبي صلى الله عليه و سلم فلقيه فشكا إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة

অনুবাদঃ "জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষাতের ওয়াদা দিয়েছিলেন। পরে আসতে দেরি করেছেন। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে আসলেন। বাইরে আসার পর জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তখন তাঁর যে কষ্ট হয়েছে সে কথা তিনি তাঁকে বললেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম জবাবে বললেন, আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না, যেখানে ছবি বা কুকুর থাকে।" -সহীহ বুখারী

১১. আয়েশা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত,

أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه و سلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت ؟ قال: ما بال هذه النمرقة. فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة

অনুবাদঃ "তিনি (আয়েশা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহা) একটি বালিশ কিনেছিলেন যাতে (প্রাণীর) আকৃতি ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করলেন না। (আয়েশা রাদিআল্লাহু তাআলা আনহা বলেন)

আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টি দেখতে পেলাম। বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাওবা করছি, আমি কী অপরাধ করেছি? তিনি বললেন, এ বালিশ কিভাবে এখানে? আমি বললাম, আমি তা কিনেছি, যাতে আপনি তাতে বসতে পারেন এবং বালিশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসব ছবির চিত্রকরদেরকে কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ, তাতে প্রাণ সঞ্চার করো দেখি! তিনি আরো বলেছেন, যে ঘরে ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।" -সহীহ বুখারী

প্রিয় পাঠক! নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উপরের হাদীসগুলোতে শুধু মূর্তির কথা বলা হয়নি; বরং যে কোনো প্রাণীর আকৃতি ও প্রতিকৃতি সম্পর্কেই বলা হয়েছে। এবং নিষেধাজ্ঞার বিশেষ যে কারণটি একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটি মূর্তি হওয়া নয়; বরং সেটি হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করার চেষ্টা, প্রকারান্তরে যা সৃষ্টিগুণে আল্লাহর সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা। এটাও এক প্রকার ছোট শিরক। এজন্যই এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে শিরকের কাছাকাছি পর্যায়ের হারাম এবং একারণেই হাদীসগুলোতে কঠিনতম ধমকি ও শাস্তির কথা বিবৃত হয়েছে।

আর যদি কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতির সঙ্গে পূজার বিষয়টি যুক্ত হয়, তাহলে তো সেটা শিরকে আকবর তথা বড় শিরকেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং কোনো মুসলিম তার পূজা করলে সে মুশরিক ও মুরতাদ হয়ে যাবে। এবিষয়ের অসংখ্য দলীল কোরআন সুন্নাহ'য় ভরপুর। এ লেখায় তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

ফিকহের উদ্ধৃতি

উপরে আমরা নমুনা হিসেবে কিছু হাদীস উল্লেখ করলাম। এছাড়াও আরো অনেক হাদীস আছে, যেগুলো প্রাণীর ছবি অঙ্কন, আকৃতি,

প্রতিকৃতি কিংবা ভাস্কর্য তৈরি, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন সবই হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহন করে; যদিও তার সঙ্গে পূজার কোনো সম্পর্ক না থাকে। এসব দলিলের আলোকে বিষয়টির উপর ইসলামের সূচনা থেকে আজ অব্দি সকল ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা ও ঐকমত্য রয়েছে।

সমকালীন অনবদ্য ফিকহ্ বিশ্বকোষ 'মাউসূআহ ফিকহিয়্যাহ কুয়েতিয়ায়' বলা হয়েছে,

وقد اتّفق الفقهاء على أنّ صنعة التّصاوير المجسّدة لإنسانٍ أو حيوانٍ حرام على فاعلها ، سواء أكانت من حجرٍ أم خشبٍ أم طينٍ أم غير ذلك ، لما روى ابن عمر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « الّذين يصنعون هذه الصّور يعذّبون يوم القيامة ، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » وعن مسروقٍ قال : دخلنا مع عبد الله بيتاً فيه تماثيل ، فقال لتمثالٍ منها : تمثال من هذا ؟ قالوا : تمثال مريم ، قال عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنّ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون » والأمر بعمله محرّم كعمله ، بل إنّ الأجرة على صنع مثل هذه الأشياء لا تجوز وهذا في مطلق التّصاوير المجسّدة ، فإذا كانت ممّا يعبد من دون الله فذلك أشدّ تحريماً. ....

7 – كما يحرم صنع هذه الأشياء يحرم بيعها واقتناؤها. الموسوعة الفقهية الكويبية: (2333/2)

অনুবাদঃ "ফুকাহায়ে কেরাম সকলেই একমত, মানুষ বা প্রাণীর শারীরিক আকৃতি তৈরি করা হারাম; চাই তা পাথর, কাঠ, মাটি কিংবা অন্য যে কোনো বস্তুরই হোক না কেন। কারণ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু

তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যারা এই প্রতিকৃতি তৈরি করে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন শাস্তি প্রদান করা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তৈরি করেছ, তাতে প্রাণ সঞ্চার করো।'

মাসরুক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে একটি ঘরে প্রবেশ করলাম, যাতে কিছু প্রতিকৃতি ছিল। তিনি একটি প্রতিকৃতি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কার প্রতিকৃতি? তারা বলল মারইয়ামের প্রতিকৃতি। আব্দুল্লাহ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে, (প্রাণীর) আকৃতি প্রস্তুতকারীদের।' তা প্রস্তুত করা যেমন হারাম, প্রস্তুতের নির্দেশ করাও হারাম। এমন বস্তু প্রস্তুতত করার পারিশ্রমিকও নাজায়েয। এই বিধান সকল শারীরিক প্রতিকৃতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর যদি তা হয় এমন বস্তু, যার পূজা করা হয়, তা হবে আরো জঘন্য হারাম। ....

৭. এগুলো প্রস্তুত করা যেমন হারাম, তেমনি বিক্রি ও সংরক্ষণ করাও হারাম” খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৩৩৩

প্রাণীর ভাস্কর্য ও মূর্তিকে হালাল বলার বিধান:

উপরের আলোচনায় ভাস্কর্য ও মূর্তির সর্বনিম্ন অবস্থা আমরা জেনেছি, তা হারাম। তৈরি, বিক্রয়, ক্রয়, প্রদর্শন, স্থাপন ইত্যাদি বিষয় ইসলামের দৃষ্টিতে অকাট্য ও সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। শরীয়তের কোন অকাট্য হারামকে হালাল বলা, হালাল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা,

আইনগতভাবে হারাম কাজ করতে বাধ্য করা, হারাম থেকে বিরত থাকাকে আইনগতভাবে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করা কুফর।

বিষয়টি বহুল আলোচিত ও প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে জাহালাত তথা নাজানার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। এরপরও ঘটনাচক্রে যদি কেউ বিষয়টি নাজানার কারণে করে থাকে, তাহলে ওলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে তা বলে দেয়ার পর আর কোন ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। নাজানার ওজরটি একেবারেই একটি সাময়িক অবস্থা, যা দীর্ঘক্ষণ থাকতে পারে না। অতএব ভাস্কর্য ও মূর্তির এ বিষয়গুলোকে হালাল বা উত্তম মনে করা, আইনগত বৈধতা দেয়া, বা আইনগত বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এর আগে মুসলমান থেকে থাকলে এখন এ কাজের কারণে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর আগে থেকে অন্য কারণে মুরতাদ হয়ে থাকলে এখন মাত্রা বৃদ্ধি পাবে।

এ বিষয়ে একটি আয়াত ও হাদীস থেকে তার ব্যাখ্যা দেখুন-

عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة { **اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله** } قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، باب ومن سورة التوبة

অনুবাদঃ "আদি ইবনে হাতিম রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম, তখন আমার গলায় একটা স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলানো ছিল। তিনি আমাকে বললেন, আদি তুমি তোমার গলা থেকে এ মূর্তিটা ফেলে দাও। তখন তিনি এ আয়াত পড়ছিলেন

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে'।

তারপর বললেন, তারা তাদের ইবাদত করত না। তবে তারা যা হালাল করে দিত তাকে তারা হালাল হিসাবে গ্রহণ করত, আর যখন কোন কিছুকে হারাম করে দিত তখন তারা তাকে হারাম হিসাবে গ্রহণ করত।" -সুনানে তিরমিযী

এ বিষয়ে হাকীমুল উম্মত থানভী রহিমাহুল্লাহ-র বক্তব্য

اس کے علاوہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور صورت ایسی ہے جس میں امیر کا فسق دوسروں تک متعدی ہو رہا ہو، یعنی امیر لوگوں کا دین خراب کر رہا ہو، مثلا لوگوں کو معصیت پر مجبور کر رہا ہو، تو اگر یہ عمل کسی ایک یا دو فرد کے ساتھ ہو تو اس کا حکم اکراہ ہوگا، اور اکراہ کے احکام جاری ہوں گے، **لیکن اگر امیر نے اس کو ایک مستقل پالیسی بنالیا کہ وہ مستقل طور سے لوگوں کو معصیتوں پر مجبور کرنے لگا ہے، اور اس میں غیر اسلامی قوانین کو شریعت کے مقابلہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے تو یہ کفر صریح ہے**، اور اگر فوقیت نہیں دیتا لیکن تاویلا (شریعت کی غلط تشریح کرکے) یا تکاسلا (سستی کی بنا پر) اس کو چھوڑا ہوا ہے تو بھی اگرچہ یہ کفر صریح نہ ہو، لیکن کفر کے حکم سے ملحق ہو سکتا ہے، کیوں

کہ اس سے شریعت کا استخفاف لازم آتا ھے، لھذا اس صورت میں بھي خروج جائز ھے، لیکن یھاں دو اھم باتیں یاد رکھني ضروري ھیں.

اسلام اور سیاسي نظریات ص: 367

অনুবাদ: "এছাড়া হযরত হাকীমুল উম্মত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আরেকটি সুরত এমন আছে, যে সুরতে আমীরের 'ফিসক' (পাপ) অন্যদের পর্যন্ত গড়ায়। অর্থাৎ আমীর মানুষের দ্বীন নষ্ট করছে। যেমন মানুষদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করছে। এক্ষেত্রে এ কাজটি যদি এক দুই ব্যক্তির সাথে হয় তাহলে তার ক্ষেত্রে ইকরাহ-বাধ্য করার বিধান হবে। তার জন্য বাধ্য করার বিধান প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আমীর ও রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন কোন নীতি গ্রহণ করে, যার মাধ্যমে সে মানুষদেরকে নিয়মিত গুনাহ করার উপর বাধ্য করতে থাকে, আর সে ক্ষেত্রে সে অনৈসলামিক আইনকে শরীয়তের বিপরীতে বেশি উপযোগী মনে করে, তাহলে তার এ আচরণ সুস্পষ্ট কুফর। আর যদি প্রাধান্য না দেয়, কিন্তু অপব্যাখ্যা করে বা অলসতা করে তাকে ছেড়ে দিয়ে আছে, সে ক্ষেত্রেও যদিও এটা সুস্পষ্ট কুফর নয়, কিন্তু কুফরের বিধানের সাথে যুক্ত হতে পারে। কেননা এর দ্বারা শরীয়তের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। অতএব এ সুরতেও বিদ্রোহ জায়েয আছে। তবে এ ক্ষেত্রে দু'টি জরুরী কথা মনে রাখা চাই।" -ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত পৃ: ৩৬৭

হাকীমুল উম্মত রহিমাহুল্লাহ এ কাজগুলোকে অনেকগুলো প্রকারে ভাগ করে কুফরের প্রকারটিকে দলিলসহ এভাবে উল্লেখ করেছেন-

....

قسم ثالث:- نعوذ باللہ کافر ہوجاوے، خواہ بکفر تکذیب و جحود وخواہ بکفر عناد و مخالفت خواہ بکفر استخفاف و استقباح امور دین....

.......................امدادالفتاوي 129/5

অনুবাদ: "৭. অপরকে গুনাহ করতে বাধ্য করার অপরাধ।

....

তৃতীয় প্রকার: নাউযুবিল্লাহ! কাফের হয়ে যাবে, চাই তা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার দ্বারা হোক বা অস্বীকার করে হোক। চাই হঠধর্মিতা ও বিরোধিতা করে হোক বা দ্বীনী বিষয় নিয়ে ঠাট্টা ও নিন্দা করে হোক। ......।" -ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১২৯

كما بسطه في أول المرتد من الدر المختار ورد المحتار، ولنقتصر على نقل بعض العبارة منه. قال في المسايرة: وبالجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب، أو بالقلب واللسان في تحقيق الإيمان أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا، كترك السجود لصنم، وقتل نبي والاستخفاف به، وبالمصحف والكعبة.

وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود.

....

قلت : ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به ، وإن لم يقصد الاستخفاف. إمداد الفتاوى 129/5-130

অনুবাদ: “যেমন আদদুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতারে মুরতাদের বয়ানের শুরুতে বিস্তারিত বলেছেন। আমরা সেখান থেকে কিছু ইবারত উল্লেখ করবব। মুসায়ারা’য় বলেছেন, মোটকথা ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অন্তর দিয়ে সত্যায়ন অথবা অন্তর ও যবানে সত্যায়নের সঙ্গে সে বিষয়গুলোকেও যুক্ত করেছেন যা সত্যায়নের পরিপন্থী হওয়ার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে ঈমান পরিপন্থী। যেমন: মূর্তিপূজা ছাড়তে হবে, কোন নবীকে হত্যা করা ছাড়তে হবে এবং নবী, মুসহাফ ও কা’বার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ছাড়তে হবে।

এমনিভাবে শরীয়তের সর্বসম্মত কোন বিষয়কে জানার পরেও তার বিরোধিতা করা বা তা অস্বীকার করা। কেননা এটা এ কথা প্রমাণ করে যে, এখানে তাসদীক-সত্যায়ন নেই।

....

আমি বলি, এর দ্বারা বোঝা যায়, যে কথা-কাজ অবজ্ঞার আলামত বহন করে, তা প্রকাশ পাওয়ার দ্বারা কাফের বলা হবে। যদিও সে অবজ্ঞা উদ্দেশ্য না করে থাকে।” ইমদাদূল ফাতাওয়া ৫/১২৯-১৩০

ভাস্কর্যর সম্মান তাআ’ব্বুদি

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভাস্কর্যকে যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, সেগুলো সব তাআ’ব্বুদি প্রকৃতির, যা মূলত খালেস ইবাদতের বৈশিষ্ট্য!

অর্থাৎ আল্লাহ্ বান্দার উপর যে ইবাদতের দায়িত্ব দিয়েছেন, তাতে দুটি দিক আছে। একটি হল যৌক্তিক দিক, আরেকটি হল আনুগত্যের দিক। যেমন সালাত মানুষকে অন্যায় ও অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে, চোরের হাত কাটলে চুরির অপরাধ বন্ধ হয়। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ

এবং ফরজ না হলেও এই সুবিধাগুলো অর্জনের জন্যই মানুষের এই কাজগুলো করা উচিত। এটি এই বিধানগুলোর অসংখ্য যৌক্তিতার একটি যৌক্তিক দিক। আরেকটি দিক হল, আল্লাহ এগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন, সুতরাং এগুলোতে কোনো যৌক্তিকতা বা বাহ্যিক সুবিধা থাকুক বা না থাকুক; আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য হিসেবেই বান্দার তা করা উচিত! এটি হল উক্ত কাজগুলোর তাআ'ব্বুদি দিক।

ইবাদতের কিছু অংশ আছে নিরেট তাআ'ব্বুদি, যেগুলো খালেস ইবাদত হিসেবেই করা হয়। সেগুলোতে বাহ্যিক কোনো যৌক্তিক দিক বান্দার জানা নেই। বরং তার যৌক্তিকতা বান্দার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধির উর্ধ্বে। এগুলোকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তাআ'ব্বুদি' বলা হয়। অর্থাৎ এই কাজগুলো করলে নিরেট ইবাদত হিসেবেই করতে হবে। যেমন মাগরিবের নামায তিন রাকাত কেন পড়ব এবং ইশার নামায চার রাকাত কেন পড়ব? এটার বাহ্যিক কোনো রায-রহস্য ও যৌক্তিকতা বান্দার জানা নেই। এটা বান্দা শুধু এই জন্যই মানে যে, এটা আমার রাব্বে কারীমের নির্দেশ। সুতরাং তাঁর নির্দেশ পালন করাই আমার দায়িত্ব ও সৌভাগ্য। আমার যুক্তিতে তা আসুক বা না আসুক।

তো ভাস্কর্যের সম্মানে তারা যে কাজগুলো করে, সেগুলোতেও এই তাআ'ব্বুদের বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান, যা উক্ত কাজগুলো ইবাদত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমন ধরুন ভাস্কর্যর সামনে হাতজোড় করে নীরবতা পালন, পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং ভাস্কর্যের সামনে থেকে উল্টোপীঠে প্রত্যাগমন ইত্যাদি। নিজের হাতে বানানো একটি জড় বস্তুর সামনে এমন কর্মকাণ্ডের কী যৌক্তিকতা ও সুবিধার দিক থাকতে পারে?

প্রাণীর ভাস্কর্য প্রকৃতিগতভাবেই পূজার উৎস

আসলে ভাস্কর্য প্রকৃতিগতভাবেই পূজার উপকরণ ও উৎস। বিশেষ করে কোনো শক্তি ও কৃতিত্বের স্মারক ভাস্কর্য। তাই ভাস্কর্য ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্য না থাকলেও ধীরে ধীরে তা মানুষকে পূজা পর্যন্ত নিয়ে যায়। আমাদের দেশে খোদ 'মুজিব ভাস্কর্যের' সামনে এমন কার্যক্রমের অসংখ্য নজির এখন হর হামেশাই দেখা যায়। আর এজন্যই দেখা যায় যারা নিয়ত করে ঘোষণা দিয়ে মূর্তির পূজা করে তাদের কার্যক্রম এবং যারা পূজা না করার দাবি করে তাদের কার্যক্রমগুলো অনেক ক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন। ওরাও মূর্তিকে অভিবাদন ও স্যালুট দেয়, এরাও ভাস্কর্যকে দেয়। ওরাও মূর্তির সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ায়, এরাও একইভাবে ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়ায়। ওরাও মূর্তিকে ফুল দেয়, এরাও ভাস্কর্যকে ফুল দেয়। ওরাও নানাভাবে মূর্তিকে সম্মান প্রদর্শন করে, এরাও একই কাজ ভাস্কর্যকে করে।

ভাস্কর্যপ্রেমী ও মূর্তি পূজারীদের মিল

ভাস্কর্য ও মূর্তির আদি ব্যবহার ও বর্তমান ব্যবহার, এমনিভাবে স্বঘোষিত মুশরিক-হিন্দুদের ব্যবহার ও অঘোষিত পূজারীদের ব্যবহারে বেশ কিছু মিল রয়েছে। যে মিলগুলো রয়েছে তা যথাক্রমে এই-

* মুশরিক-হিন্দুরা ভাস্কর্য ও মূর্তির সামনে অর্ঘ্য দেয়। অঘোষিত পূজারীরাও ভাস্কর্য ও মূর্তিকে পুষ্পমাল্য, পুষ্পস্তবক দেয়। কুরআনের এ আয়াতটি দেখুন-

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) سورة الأنعام

অনুবাদ: “তারা তাদের উৎপাদিত ফসল ও চতুষ্পদ প্রাণীর একটি অংশ আল্লাহর জন্য রাখে। তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর জন্য, আর এটা আমাদের শরিকদের জন্য। অতঃপর তাদের শরিকদের জন্য বরাদ্দ অংশ আল্লাহর কাছে যায় না, কিন্তু আল্লাহর জন্য বরাদ্দ অংশ তাদের শরিকদের কাছে চলে যায়। কতই না নিকৃষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত।” -সূরা আনআম ১৩৬

* মুশরিক-হিন্দুরা ভাস্কর্য ও মূর্তির সামনে শতভাগ আদব রক্ষা করে চলার চেষ্টা করে। অঘোষিত পূজারীরাও শতভাগ আদব রক্ষা করে চলার চেষ্টা করে। আদব রক্ষা করার ধরণগুলো এমন থাকে যেন, ভাস্কর্য ও মূর্তি বেয়াদবি বুঝে ফেলবে। কুরআনের এ আয়াতটি দেখুন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) سورة بقرة

অনুবাদ: “মানুষের মাঝে কতক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অনেক শরিক গ্রহণ করে। তারা সেসব শরিককে আল্লাহর মত ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে অনেক ভালোবাসে। যারা অন্যায় করছে তারা যখন আযাব দেখবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, সকল শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।” -সূরা বাকারা ১৬৫

* মুশরিক-হিন্দুরা ভাস্কর্য ও মূর্তির সামনে স্যালুট, প্রণাম, মাথানত, রুকু ও সেজদা করে। অঘোষিত পূজারীরা স্যালুট করে, মাথানত করে ও নিরবতা পালন করে। কয়েকটি আয়াত দেখুন-

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) سورة المائدة

অনুবাদ: "তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত কর, যা তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার শক্তি রাখে না? আল্লাহই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" -সূরা মায়েদাহ ৭৬

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) سورة الصافات

অনুবাদ: "তোমরা যা খোদাই কর তারই ইবাদত কর? অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তা সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল, তার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড বানাও এবং জ্বলন্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ কর।" সূরা সাফফাত ৯৫-৯৭

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) سورة النمل

অনুবাদ: "আমি তাকে এবং তার জাতিকে পেয়েছি, তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সেজদা করে। শয়তান তাদের আমলগুলোকে সাজিয়ে দিয়েছে, ফলে সে তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিমুখ করে রেখেছে, এ কারণে তারা সঠিক পথ পায় না।" -সূরা নামল ২৪

* মুশরিকরা নির্দিষ্ট দিন তারিখ ও নির্দিষ্ট সময়ে ভাস্কর্য ও মূর্তির সামনে উপস্থিত হওয়াকে জরুরী মনে করে। অঘোষিত পূজারীরা নির্দিষ্ট

দিন তারিখ ও সময়ে ভাস্কর্য ও মূর্তির সামনে উপস্থিত হওয়া জরুরী মনে করে।

* মুশরিক-হিন্দুরা ভাস্কর্য ও মূর্তির সম্মানকে সকল আইনের উর্দ্ধে স্থান দেয়। অঘোষিত পূজারীরা ভাস্কর্য ও মূর্তির সম্মানকে শরয়ী সকল আইনের উর্দ্ধে স্থান দেয়। আল্লাহ-রাসূল, কুরআন-হাদীস অবমানার চাইতে ভাস্কর্য ও মূর্তির অবমাননাকে বড় অপরাধ হিসাবে ধর্তব্য করে। এ বিষয়ে দু'টি আয়াত দেখুন-

قَالُوا يَاشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) سورة هود

অনুবাদ: "তারা বলল, হে শোয়াইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ আদেশ করে যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদত করত আমরা তাদের ইবাদত ছেড়ে দেব? এবং আমরা আমাদের সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে খরচ করব না? নিশ্চয় তুমি একজন ধৈর্যশীল ভালো মানুষ।" -সূরা হূদ ৮৭

قَالُوا يَاصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) سورة هود

অনুবাদ: "তারা বলল, হে সালেহ! তুমি এর আগে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ছিলে। তুমি কি আমাদেরকে সেসব মাবূদের ইবাদত করতে নিষেধ করছ, আমাদের বাপ-দাদারা যেসব মাবূদের ইবাদত করত? তুমি আমাদেরকে যে দিকে ডাকছ সে বিষয়ে আমরা সংশয় ও সন্দিহান আছি।" -সূরা হূদ ৬২

সুতরাং আমরা বলতে পারি, অঘোষিত পূজারীরা ভাস্কর্য ও মূর্তির সঙ্গে যে আচরণগুলো করে থাকে তার অনেকগুলোই মুশরিকদের আচরণের হুবহু। আর বাকি আচরণগুলো এমন, যা একজন পূজারীকে অচিরেই শিরকের দরজায় পৌঁছে দেবে।

ভাস্কর্য ও মূর্তির উৎস সংবিধান ও গণতন্ত্র

এ শিরোনামের কথাগুলোই আমাদের এ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। আশা করি সকল মুসলিম বিশেষ করে উলামায়ে উম্মত বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করবেন। ভাস্কর্যের মূর্তির চেয়েও অনেক ভয়ঙ্কর মূর্তি এবং ভাস্কর্যসহ এমন আরো অসংখ্য কুফর শিরকের জনক ও উৎসমূলটি চিহ্নিত করে সে ক্ষেত্রে আমাদের শরঈ ফরিজা কি, সেদিকে মনোনিবেশ করবেন!

ভাস্কর্য ও মূর্তির যে চর্চা ও প্রসার এখন চলছে, তার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে মানবরচিত সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক কুফরী নীতিমালা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলামানদের একটি দেশে একটি অকাট্য হারাম কিভাবে আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে? তা তলিয়ে দেখলে আমাদের সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, গণতন্ত্র ও মানবরচিত সংবিধানের শক্তির বিপরীতে এখানে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তিই বেশি। মুসলমান তার শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগালে প্রতিটি সিদ্ধান্ত নেয়া হত কুরআন ও হাদীস থেকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তকে এখানে শিরোধার্য মনে করা হত। আর তখন যে কোনো আইন করার আগে কুরআন হাদীসকে জিজ্ঞেস করা হত। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন কাজ করার ক্ষেত্রে আগে কুরআন ও হাদীস থেকে অনুমতি নেয়া হত। আর সে সূত্রে অকাট্য হারাম ও কুফরগুলো তার অঙ্কুরেই মাটিচাপা পড়ে যেত।

কিন্তু দেশ ও দেশের পরিচালনাকে সেভাবে সাজানো হয়নি। দেশকে সাজানো হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। যার ফলে দেশের শক্তিশালী ক্ষমতাধর পক্ষ বা তার অধিকাংশ যে বিষয়টিকে বৈধ বলছে তা বৈধ হিসাবে সংবিধানে ও আইনে স্থান পাচ্ছে। আর যে বিষয়টিকে তারা অবৈধ বলছে, তা অবৈধ হিসাবে সংবিধান ও আইনে স্থান পাচ্ছে। আর এভাবেই এবং এ সূত্রেই কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত অসংখ্য হারামকে হালাল ও বৈধ বলে দেয়া হয়েছে, আবার অসংখ্য হালালকে হারাম ও অবৈধ বলে দেয়া হয়েছে। অসংখ্য কুফরকে আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে এবং ঈমানের অসংখ্য শাখা প্রশাখাকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংবিধান তৈরি করার কারণে। আইন প্রবর্তনের দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে, সে দায়িত্বকে নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নেয়ার কারণে।

সুতরাং মুসলমান যত দিন তার আইন প্রবর্তনের দায়িত্ব শরীয়তের হাতে ন্যস্ত না করবে, তত দিন এ অপরাধগুলো থেকে তারা নিজেদেরকে পাক করতে পারবে না। নিজেদের হাতে আইনের চাবিকাঠি গচ্ছিত রেখে, আইন প্রণয়নের দায়িত্ব নিজেদের হাতে রেখে শরীয়তের অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

মানবরচিত সংবিধানে ভাস্কর্য ও মূর্তিকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। প্রতিকৃতি স্থাপন এবং এর সম্মান করাকে আবশ্যক করা হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে -

> *“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী*

ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।”[১]

যার ফলে ভাস্কর্য ও মূর্তি এবং এ জাতীয় আরো যত হারাম ও কুফর-শিরক রাষ্ট্রীয়ভাবে করা হয়, সেসব হারাম ও কুফরের ক্ষেত্রে তারা সংবিধানের উদ্ধৃতি দিয়ে সামনে চলার চেষ্টা করে থাকে। সেসব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, মুসলমানরাও সংবিধানের উদ্ধৃতি দিয়েই সেসব কাজের বিরোধিতা করার চেষ্টা করে থাকে। রাষ্ট্রপক্ষ এবং মুসলমানদের মনে এমন একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, বিরোধপূর্ণ কোন বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতির চাইতে সংবিধানের উদ্ধৃতিই বেশি শক্তিশালী। আর এভাবেই মানবরচিত আইন ও সংবিধান মুসলমানদের মনে কুরআন ও হাদীসের বিপরীতে একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। তারা মানবরচিত সংবিধানের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলতে মনের মধ্যে যে শক্তি অনুভব করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলতে ততটা শক্তি অনুভব করে না।

এমন নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের করণীয় কী?

এসব হারাম ও কুফর মুলোৎপাটনের শরয়ী পদ্ধতি

রাষ্ট্রপক্ষ যখন কোন প্রকার হারাম ও কুফরে লিপ্ত হয় তখন মুসলমানদের পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো করণীয় রয়েছে।

প্রথমত কুফর ও শিরকে লিপ্ত পক্ষকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবে যে, এসব আচরণ হারাম ও কুফর। এসব আচরণ থেকে বিরত থাকুন।

[১] বাংলাদেশের সংবিধান, ৪ক, ‘জাতির পিতার প্রতিকৃতি’

দ্বিতীয়ত মুসলমানরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছবে যে, রাষ্ট্রপক্ষের সামনে হারামকে হারাম হিসাবে এবং কুফরকে কুফর হিসাবে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হারামকে হারাম বলা এবং কুফরকে কুফর বলার বিষয়ে কোন প্রকার লুকোচুরি করা যাবে না। কোন প্রকার অস্পষ্টতা রাখা যাবে না।

তৃতীয়ত মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নেবে যে, আলোচ্য হারাম ও কুফর থেকে বিরত না হওয়ার কারণে রাষ্ট্রপক্ষ ফাসিক হয়েছে? না কি কাফের হয়েছে?

চতুর্থত যদি ফাসেক হয়, তাহলে মুসলমানরা রাষ্ট্রপক্ষের সামনে তার আপরাধগুলোর মৌখিকভাবে প্রতবাদ করে যাবে। তার অন্যায়কে অন্যয় বলে যাবে। নিজেদেরকে সেসব অন্যায় থেকে বিরত রাখবে। কোন অবস্থাতেই সেসব অপরাধের সাথে নিজেকে জড়াবে না।

পঞ্চমত যদি কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা। অপসারণ করতে গিয়ে যত ধরনের শক্তি ব্যবহার করতে হয়, সে সকল শক্তি ব্যয় করা মুসলমানদের উপর ফরয। শক্তি না থাকলে শক্তি অর্জন করা ফরয।

ষষ্ঠত অপসারণ করার আগ পর্যন্ত দু'টি কাজ।

এক. বারাআত তথা রাষ্ট্রের সব ধরনের আনুগত্য থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা।

দুই. হিজরত করা।

এ বিষয়ে কাযী ইয়ায রহিমাহুল্লাহ ও ইবনে হাজার আসকালনী রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্যগুলো দেখুন-

قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول.

قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية

অনুবাদঃ "কাজি ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ওলামায়ে কেরামের ইজমা হল নেতৃত্ব (ইমামাহ) কখনো কাফিরের হাতে অর্পণ করা যাবে না। আর যদি তার (ইমাম) থেকে কুফর প্রকাশিত হয় তবে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। এমনিভাবে সে যদি নামায কায়েম করা এবং নামাযের দিকে ডাকা ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, এমনিভাবে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে বিদআতের কারণেও সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। তিনি বলেন, বসরার ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেছেন, তার ইমামত সাব্যস্ত হবে এবং তা বহাল থাকবে; কেননা সে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে করে।

কাযী ইয়ায বলেন, সুতরাং যদি সে কুফর করে, এবং শরীয়াহ পরিবর্তন করে অথবা তার পক্ষ থেকে কোন বিদআত প্রকাশিত হয়, তবে সে নেতৃত্বের অধিকার হারিয়ে ফেলবে এবং তার আনুগত্য পাবার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। তখন মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে তার বিরোধিতা করা, বিদ্রোহ করা, তার পতন ঘটানো এবং তার স্থলে একজন ন্যায়পরায়ণ ইমামকে বসানো; যদি তারা (মুসলিমরা) সক্ষম হয়। যদি একটি দল (তাইফা) ব্যতীত অন্যান্য মুসলিমদের পক্ষে এটা করা সম্ভব না হয়, তবে যে দলের (তাইফা) সক্ষমতা আছে তাদের জন্য এই কাফিরের (শাসকের) পতন ঘটানো অবশ্য কর্তব্য। আর যদি শাসক বিদআতী হয় তবে, তা ওয়াজিব হবে না, তবে যদি তারা (তাইফা) সক্ষম হবে বলে মনে করে তাহলে তাকে ক্ষতাচ্যুত করবে। আর যদি কেউই সক্ষম না হয় এবং এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব নয়, তবে তখন মুসলিমদের সেই ভূমি থেকে অন্য কোথাও হিজরত করতে হবে, নিজেদের দ্বীনের সংরক্ষণের জন্য।”
-শারহুন নববী আলা সাহীহি মুসলিম ১২/২২৯

ইমাম ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন-

وقد تقدم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا بما يغني عن إعادته وهو في كتاب الفتن وملخصه: إنه ينعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه الإثم ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 123/13، المكتبة السلفية

অনুবাদ: “উবাদা ইবনে সামিত রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু এর হাদীস الأمر بالسمع والطاعة الا أن تروا كفرا بواحا এর উপর এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যা পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তা করা হয়েছে কিতাবুল ফিতানে, যার সারকথা হচ্ছে, ইজমা তথা ঐক্যমতে শাসক কুফরী করলে সে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যাবে। তখন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। তখন যে তা করতে সক্ষম হবে সে সাওয়াব পাবে, যে কাফেরের চাটুকারিতা করবে সে গুনাহগার হবে, আর যে অক্ষম হবে তার উপর সে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করা ওয়াজিব।” -ফাতহুল বারী শরহু সাহীহিল বুখারী, হাফেয ইবনে হাজার, কিতাবুল আহকাম,

باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية,13/123

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে, সকল মুসলমানকে শরয়ী বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার তাওফীক দান করুন। সময়ের করণীয়গুলো বুঝে নেয়ার তাওফীক দান করুন। দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

***